নীলের বিশ্বায়ন

নীল ও ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দাগিরি

জার্নিম্যান
বুক্স

নীলের বিশ্বায়ন

নীল ও ঔপনিবেশিক বাংলায় গোয়েন্দাগিরি

পিয়ের পল দারাক
ও
ভেলাম ভান সেন্দেল

অনুবাদ: ফওজুল করিম

জার্নিম্যান

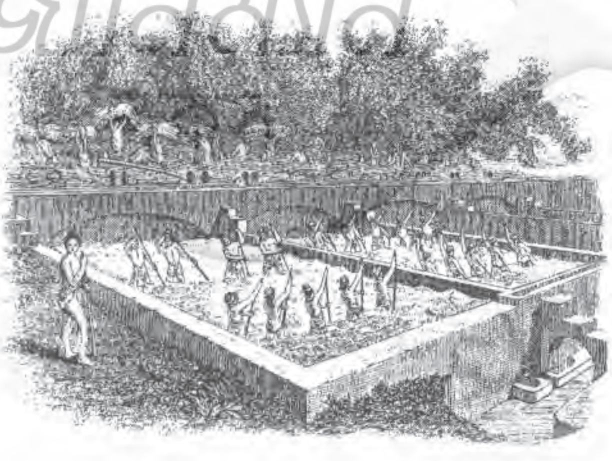

জার্নিম্যান
বুকস্

উৎসর্গ

মুনতাসীর মামুন

জার্নিম্যান
বুক্‌স

প্রথম পর্ব

সূচিপত্র

অবতরণিকা ৯

প্রথম পর্ব ঃ *ভেলাম ভান সেন্দেল*

১। ভূমিকা ঃ নীলের বিশ্বায়ন ১৩
২। নীল দুনিয়া ঃ বিশ্ব-পণ্য হিসাবে নীল ১৬
৩। নীলের বাণিজ্যে আধিপত্য ঃ স্পেন, ফ্রান্স ও বৃটেন ২১
৪। নতুন অঞ্চল ঃ বঙ্গদেশ ২৭
৫। শ্রমিক, ফ্যাক্টরি ও শিল্পোদ্যোক্তা ৩১
৬। আফ্রিকায় নীল চাষের ফরাসী স্বপ্ন ৩৫
৭। কৃষি শিল্প গোয়েন্দাগিরি ঃ দারাক রিপোর্ট ৩৮

দ্বিতীয় পর্ব ঃ *পিয়ের পল দারাক*

বঙ্গদেশে নীলের চাষাবাদ ও নীল প্রস্তুতকরণ রিপোর্ট ৫৭
নীল-চাষের জমির বৈশিষ্ট্য ৫৮
কর্ষণ করা ৫৯
নীলের বীজ ও তার প্রকারভেদ ৬০
বপন ৬১
আগাছা সাফ করা ৬৪
ফসল কাটা ৬৫
পরিবহন ৬৫
হিন্দুস্তানে নীল চাষ ৬৮
বাংলাদেশে নীলের প্রক্রিয়াজাতকরণ ৭১
গ্যাঁজানো ৭৫
পেটানো ৭৬
নিষ্কাষণ ৭৮
বয়লার ও দানাগুলো সেদ্ধ করা ৮০
ফিল্টার ও পরিশ্রুতকরণ ৮২
বাক্স বন্ধ করা ৮৪
শুকানোর ঘর ৮৫
চুল্লী ৮৫
মন্তব্য ৮৭

অবতরণিকা

এই বইটি উৎসর্গ করা হয়েছে মুনতাসীর মামুনকে। অকস্মাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা বৃটিশ লাইব্রেরিতে। দেখা হতেই তিনি আমাকে বললেন, বাংলাদেশে নীলচাষ সম্পর্কে ফরাসী ভাষায় লেখা একটি রিপোর্ট প্রসঙ্গে —ওই রিপোর্টটি নাকি নীলচাষ সম্পর্কে লেখা সর্বপ্রথম রিপোর্ট। তখন পর্যন্ত কোনো ইতিহাসবেত্তার নজর পড়েনি সেদিকে। স্বভাবতঃই মামুন তার বিষয়বস্তু জানতে একান্ত উদগ্রীব। এ ব্যাপারে একটি বিষয়ে আমরা একমত হলাম যে রিপোর্টটি অনুবাদ করা উচিত ও তারপর তা প্রকাশ করা উচিত। শুধু তাই নয়, এই প্রক্রিয়ার প্রথম অংশে আমার একটি ভূমিকা থাকতে পারে। বস্তুতঃ বইটি একান্তই মামুনের নিজস্ব ভাবনা-চিন্তার ফসল।

বইটিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে ঃ ১৮২৩ সালে পিয়ের পল দারাক লিখিত ফরাসী রিপোর্টের একটি ভূমিকা। এটি রিপোর্টের একটি পটভূমিকা বিশেষ। এই অংশে বলা হয়েছে যে, অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ঔপনিবেশিক দুনিয়ায় নীলচাষ কেমন করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরিত হত। গোটা বিশ্বে নীলচাষের পটভূমিকায় বিবরণ দেয়া হয়েছে বঙ্গদেশের নীল চাষের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদ্বন্দ্বী ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলোর কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে যে কি পরিমাণ গোয়েন্দাগিরি চলত তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে দারাকের রিপোর্টটি বিবেচিত হতে পারে।

দ্বিতীয় খণ্ডটি হচ্ছে, দারাকের রিপোর্টের ইংরাজি অনুবাদ। এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থ থেকে কয়েকটি ছবি। রিপোর্টের অনুবাদ প্রকাশের অনুমতি দান করায় বৃটিশ লাইব্রেরিকে (ওরিয়েন্টাল ও ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি) ধন্যবাদ।

আমস্টারডাম

ভেলাম ভান সেন্দেল

ভূমিকা ঃ নীলের বিশ্বায়ন

হাওয়াই-এর একটি রেষ্টুরেন্ট ও লিথুয়ানিয়ার একটি ক্যাফের মধ্যে সাধারণ সম্পর্ক কি থাকতে পারে? তুরস্ক ও চিলির দু'টি ট্র্যাভেল এজেন্সি ও সিঙ্গাপুরের একটি ফিল্ম ফেষ্টিভেলের মধ্যেই বা যোগসূত্রটি কি? এ প্রশ্নের উত্তর হল এদের সবারই নাম— "নীল"। হ্যাঁ— নীল। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার আদিবাসীদের উপজাতীয় ও লোকসংস্কৃতির নিদর্শন বিক্রেতা একটি আর্ট গ্যালারির নাম নীল, আবার উত্তর ভারতে পুরুষদের দামি পোষাক বিক্রেতা বিপনীবিতানের নামও "নীল"।

আধুনিক বিশ্বের অনেক দেশের লোকের কাছে নীল শব্দটি রোমান্টিকতার সুঘ্রাণে সুবাসিত। শব্দটি শুনলে সেই কোনো এক চাঁদনি রাতে সাহারা মরু-প্রান্তরে নীল রং-এর হেজাব পরিহিতা তুয়ারেগ রমণীর সুখস্মৃতি মনে পড়ে। কারু মনে পড়তে পারে মনের আনন্দে বাজানো জাজ্ যন্ত্রসঙ্গীতের মনোমুগ্ধকর সুর নয়তো, ক্লাসিক ব্লু জীনস-এর সঙ্গে সম্পর্কিত সাদামাটা জীবন-যাপনের সুখস্মৃতি নীল শব্দটি স্পর্শ করে মনকে। আর, এতে বাজিমাত করা যায়। তাই, এতে আর আশ্চর্য কি যে, মানুষের জীবনধারা ও মন মেজাজ নিয়ে যারা ব্যবসা করে তাদের কাছে শব্দটি হবে যুতসই। ১৯৩১ সালে ডিউক অফ এলিংটন যে দিন "মুড ইন্ডিগো" নামের ব্লু সঙ্গীতটি গেয়েছিলেন তখন থেকেই কথাটি সঙ্গীত জগতে জনপ্রিয়, তা রেকর্ড-এর লেবেল হিসাবে হোক অথবা ফিলিপাইন থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সফল কোনো ব্যান্ড সঙ্গীতই হোক। আধুনিক শিল্প-উদ্যোগের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের মার্কা বা চিহ্ন হিসাবেও শব্দটি আজকাল সুপরিচিত। ভেষজ তেল, জোর্তিবিদ্যার মানচিত্র বা লামা উলের পোষাক —সে যে কোনো ধরনের পণ্য দ্রব্য হোকনা কেন তার মার্কা বা চিহ্ন নীল, শব্দটি হতে পারে। দু'টি নতুন ক্ষেত্রে শব্দটি ব্যবহারের জন্য নীলের সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বেড়ে গেছে বহু গুণে। একটি হল নীল শিশু —বলা হচ্ছে প্রতিভাবান শিশুদের— এই শিশুদের জন্য আবার বিশেষ ধরনের বই, শিক্ষার উপকরণ, এমনকি বিশেষ ধরনের স্কুল, এসব নিয়ে প্রায় বলতে গেলে দাঁড়িয়ে গেছে ছোটোখাট একটি কুটির শিল্প। অন্য ক্ষেত্রটি হচ্ছে কম্পিউটার। প্রোগ্রামিং -এর ওয়েব ডিজাইনিং থেকে শুরু করে জাপানের একটি ইন্টারনেট কনসালটিং ফার্মের নাম হচ্ছে ইন্ডিগো বা নীল। একবিংশ শতাব্দীতে মানসম্পন্ন জীবনযাত্রা ও জীবনধারা কথাটি বোঝাতে বিশ্বব্যাপী যে শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে তা হল নীল।

ভাবনার জগতে চিত্রকল্প হিসাবে বিশ্বব্যাপী নীল শব্দটির বিস্তার দু'টি কারণে তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমতঃ নীল এখন আর প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ নয়। রঞ্জক হিসাবে নীলের গুঁড়া প্রায় শতাব্দীকাল আগে বাজার থেকে বিলুপ্ত। নীলের গাছ আজকাল এতই বিরল যে খুব কম লোকই চোখে দেখেছে এই গাছ। নীল গাছ চোখে দেখে চিনতে

পারবে এমন লোকই বা কজন। জনপ্রিয় শব্দ হিসাবে বিশ্বব্যাপি চমক লাগানোর যে চেষ্টা, তা নেহায়েতই রোমান্টিসিজম। নীল সম্পর্কে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কম লোকেরই আছে।

দ্বিতীয়ত ঃ হাল আমলে নীলের তাৎপর্যময় গূঢ় অর্থ একেবারে বদলে গেছে। ষোড়শ থেকে উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি প্রধান পণ্য দ্রব্য ছিল নীল। নীলচাষের সঙ্গে লোভ-লালসা নিষ্ঠুরতা বীভৎসতা এসব ছিল জড়িত। আজকাল নীল বলতে মানসপটে যে চিত্রকল্প ভেসে ওঠে তা ভিন্ন। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে নীলচাষের সঙ্গে ক্রীতদাস ব্যবস্থা ও বাধ্যতামূলক শ্রমের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। উন্নত জীবনধারা ও মহোত্তর জীবনচর্যার সঙ্গে ওই সব সেকেলে ব্যবস্থার কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না।

পরবর্তীকালে সাংস্কৃতিক ধারাক্রমে নীল শব্দটির নতুন অর্থের বিষয়টি বেশ আগ্রহোদ্দীপক বিশ্বে রুচিশীল জীবনধারা ও প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতীক হিসাবে নীল শব্দটির আবির্ভাবের কাহিনী বাস্তবিক চমকপ্রদ। স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে একটি শব্দের অর্থ যে কি করে বদলায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই নীল শব্দটি। অন্য একটি বইয়ে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে। তবে বর্তমান বইটির উদ্দেশ্য ভিন্ন। একটি ঐতিহাসিক পণ্য দ্রব্য হিসাবে নীল-এর বৃত্তান্তই এই বইটির লক্ষ্য। বর্তমানে নীলের সুখানুভূতি উদ্রেককারী বিশেষ অর্থ— এ বইয়ের আলোচ্য নয়। বেশ কয়েক শতাব্দী নীল ছিল বিশ্ববাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ পণ্য দ্রব্য। বিশ্বের প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী কোম্পানীগুলো নীলের ব্যবসার জন্য ছিল পাগল। আধুনিক বিশ্বের গঠনে নীলের অবদান অপরিসীম। বিশ্বের দূরতম অঞ্চলগুলোর মানুষের মধ্যে যোগসূত্র রচনায় নীলের ভূমিকা কম নয়। বিশ্বায়নের পথ-নির্দেশক বলা যেতে পারে নীলকে। এ সবকিছু সত্ত্বেও নীল সম্পর্কে গবেষণা আশানুরূপ নয়। নীলের ইতিহাস বলতে আমরা যা পাই তা হল সংক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কতগুলো আঞ্চলিক ইতিহাসের মত।

যেখানে যেখানে নীলের চাষ করা হয়েছে, নীল প্রক্রিয়াজাত করা হয়েছে, নীলের ব্যবসা করা হয়েছে ও রং হিসাবে নীল ব্যবহার করা হয়েছে সে সব সমাজে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে নীলচাষ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বে নীলচাষের প্রধান কেন্দ্র ছিল দক্ষিণ এশিয়া। আর দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্গত বঙ্গদেশ ছিল নীলচাষের স্বর্গভূমি। উনবিংশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এর সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়। বঙ্গদেশে নীলচাষ নিয়ে গবেষণা যে করা হয় নি তা কিন্তু নয়। তবে সে বিবরণ ছিল নিতান্তই একপেশে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নীলচাষের ইতিহাস থেকে বঙ্গদেশে নীলচাষের ইতিহাসকে দেখা হয়েছে একেবারে আলাদা করে স্বতন্ত্রভাবে। আসলে বঙ্গদেশে নীলচাষ তো নীলের বিশ্বায়নের একটি অংশ মাত্র। ওই সব বিবরণ থেকে সমাজের উপর নীলচাষের সামাজিক ও

অর্থনৈতিক দিক যত না জানতে পারি তার চেয়ে অনেক ভাল জানতে পারি বঙ্গদেশে নীলচাষের রাজনীতি নিয়ে কলহ ও বিবাদ বিসম্বাদের ব্যাপারে।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে কি করে নীলচাষ করা হত সে সম্পর্কেই এই বইটির রচনা। বইটির দ্বিতীয় খন্ডে আছে নীলচাষ সম্পর্কে একটি অপ্রকাশিত ঐতিহাসিক দলিল। বঙ্গদেশে নীলচাষ সম্পর্কে যে বইপত্র ও দলিল দস্তাবেজ আছে তাতে এ রিপোর্টের উল্লেখ নেই। পিয়ের-পল দারাক-এর রিপোর্টটি অনুবাদ করা হয়েছে একটি ফরাসী পান্ডুলিপি থেকে। বঙ্গদেশে নীল উৎপাদনের নিখুঁত বর্ণনা আছে বইটিতে। আর বাড়তি যা আছে তা হচ্ছে ঃ ১৮২০ সালে পশ্চিম আফ্রিকায় নীল শিল্প প্রতিষ্ঠার ফরাসী অভিসন্ধি সম্পর্কে অপ্রকাশিত নতুন তথ্য।

নিচের পরিচ্ছেদগুলো (প্রথম পর্ব) দারাকের রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত সার। বঙ্গদেশে নীল উৎপাদনের সংক্ষিপ্তসার। এতে রয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নীল উৎপাদনের আন্তর্জাতিক পটভূমি। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে হঠাৎ কি করে নীল উৎপাদনকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটল তার ব্যাখ্যা। এতে আরও আছে দারাকের রির্পোট প্রকাশিত হওয়ায় বৃটিশ ও ফরাসী সাম্রাজ্যের মধ্যে নীল নিয়ে শুরু হল প্রবল প্রতিযোগিতা। এর সঙ্গে আমার প্রস্তাব অনুযায়ী বঙ্গদেশে নীল চাষের একটি নতুন পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কিত নিবন্ধ সংযোজনঃ ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নীল উৎপাদনের দীর্ঘ বিশ্ব ইতিহাসের মধ্যে বঙ্গদেশে লাভজনকভাবে নীল উৎপাদনের (১৭৯০-১৮৬০) সময়টি আমার আলোচ্য বিষয়। এই সময় বঙ্গদেশের নীলকরদের সঙ্গে বিশ্বের অন্যান্য স্থানের নীলকরদের সম্পর্কের বিষয়টিও আমার আলোচনার অন্তর্ভুক্ত। আমরা দেখব বঙ্গদেশের নীলের সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে তা কি করে জাতীয় কাঠামোর আলোচনায় পর্যবসিত হয়। এখন প্রয়োজন হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারিত করে ইন্ডিগো ব্লুকে বিশ্ব পটভূমিকায় সংস্থাপন করা।

২

নীল দুনিয়া ঃ বিশ্ব পণ্য হিসাবে নীল

প্রাকৃতিক নীল রঞ্জক পদার্থের স্বাভাবিক সৌন্দর্য মানুষ আবিষ্কার করে লিখিত ইতিহাসের আগে। লতাগুল্ম ও বৃক্ষরাজির নীল রঞ্জক পদার্থ নিষ্কাষণের পদ্ধতি আবিষ্কার হয় পৃথিবীর নানা জায়গায়। প্রাচীনকালে এই প্রক্রিয়ার বিস্তার ঘটে নানান দেশে।[১] এর মধ্যে যুতসই রং হল এক ধরনের পাকা নীল, যা পাওয়া যায় বিভিন্ন উদ্ভিদের পাতায়। এই রঞ্জক পদার্থের নাম হল ইন্ডিগো।

নীলের গাছ বিভিন্ন রকম হলেও নীল রং কিন্তু একই। চীনা ও জাপানীরা ব্যবহার করে একটি বিশেষ বৃক্ষ পরিবারের পাতা (চীনা ভাষায় একে বলে 'লিয়াও-লান আর জাপানীরা বলে আই') ইউরোপীয়রা ব্যবহার করে অন্য রকম পাতা (ফরাসীতে বলে 'প্যাষ্টেল' আর ইংরাজীতে 'ওয়ার্ড') আবার পশ্চিম আফ্রিকার মানুষ ব্যবহার করে আরেক রকম পাতা (ইয়োরুবা ভাষায় যার নাম এলু)[২] তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নীল রং নিষ্কাষণের জন্য যে যে বৃক্ষ পরিবারের পাতা ব্যবহার করা হয় তা কিন্তু এসব পাতা থেকে ভিন্ন রকম। এ গাছের নাম হল "ইন্ডিগোফেরা"। এ গাছে উৎপন্ন হয় শুধু উষ্ণ মন্ডলে ও উম-উষ্ণ মন্ডলে। ব্যবসায়িক কাজে যে রকম নীল ব্যবহার হয় তা এই ধরনের গাছ। বিভিন্ন কায়দায় বিভিন্ন রকম গাছ থেকে নীল নিষ্কাষণ করা হলেও তা একই রং ঃ

"নীল রং থুরিঙ্গীয় খামারের ওয়াড গাছ থেকে আসুক অথবা ভারতের ইন্ডিগোফেরা থেকেই আসুক, বিশেষজ্ঞরাও বলতে পারবেন না যে এ রং অভিন্ন। নীল রং এর সূত্র জাপানী দ্বীপের পলিগোনিয়াম টিংটোরিয়াম-ই হোক অথবা দূরপ্রাচ্যের গ্রামবাসীদের উৎপাদিত একটি বিশেষ বর্গের গাছ থেকেই হোক অথবা পশ্চিম আফ্রিকা থেকেই হোক এ রং এক ও অভিন্ন।"[৩]

নীল রং-এর জন্য বহুল ব্যবহৃত যে গাছ (উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের কাছে যা ইন্ডিগোফেরা টিংটোরিয়া এল নামে পরিচিত) সম্ভবতঃ তার জন্ম দক্ষিণ এশিয়াতে। তারপর প্রাচীনকালেই তা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও সেখান থেকে আমেরিকায় বিস্তার লাভ করে। দক্ষিণ এশিয়ায় ইন্ডিগোর প্রতিশব্দ হল নীল। বিভিন্ন দেশে নীলের বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে এই নীল শব্দটিও পরিচিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইন্ডিগো পরিচিত "নীলা" নামে; আরবীতে হল "আন্নীল" আর স্পেনীয় ভাষায় হল "আনীল"। ষোড়শ শতাব্দীর ল্যাটিন আমেরিকার সর্বত্রই শব্দটি এই নামেই পরিচিত হয়, ব্যবসার ক্ষেত্রেও এই একই নাম। ইন্ডিগো শব্দটিও দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। গ্রীক ভাষার শব্দ "ইন্ডিকন" (ভারত থেকে আমদানি করা) থেকে ইন্ডিগো

শব্দটি উদ্ভুত। কেননা গ্রীকরা নীল রং আমদানী করত ভারত থেকে। শব্দ দু'টি কখনও কখনও এক সঙ্গে ব্যবহার করা হত। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, উনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসীরা নীল-ক্ষেতের নীলকে বলত "আনিল আর প্রক্রিয়ার পর যে দ্রব্য পাওয়া যেত তাকে বলত ইন্ডিগো"।[৪] ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীতে যখন কৃত্রিম নীল বাজারজাত করা শুরু হল তখন এই নতুন পণ্যদ্রব্যের নাম আনিল থেকে হল "আনিলাইন"।[৫]

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন অংশে নীল উৎপাদিত হত, নীলের বাণিজ্য চলত বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে।[৬] দুনিয়াজোড়া নীলের ব্যবসায়ে বিরাট এক পরিবর্তন এল ষোড়শ শতাব্দীতে। নীল পরিণত হল আন্তর্জাতিক পণ্য দ্রব্যে। এই অবস্থা বিদ্যমান ছিল বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যবস্থার মধ্যে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের অনুপ্রবেশের ফলে নীলের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এমন এক অবস্থার উদ্ভব হল যা বাস্তবিকই ছিল অপরিবর্তনীয়। ইউরোপীয় বাজারে অন্যান্য আরও কিছু পণ্য দ্রব্যের (বিশেষভাবে মশলা ও মিহি কাপড়) সঙ্গে নীলের দাম পড়তে লাগল। তখন নীল দক্ষিণ এশিয়া হতে আরব উপদ্বীপ ঘুরে আসত ইউরোপের বাজারে। স্থলপথে কিংবা সাগর পথে আসার সময় মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার রাজ রাজারা নীলের উপর শুল্ক আরোপ করত। এই বাণিজ্য তখন নিয়ন্ত্রণ করত ভারতীয় আর্মেনীয় ইটালীয় ও পারস্য দেশীয় ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় ব্যবসায়ীরা। এশিয়া থেকে ইউরোপে আসার নতুন সামুদ্রিক বাণিজ্য পথ হল আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে মাল পৌছার আগে মাঝপথের মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রাচ্যের পণ্য দ্রব্য আসতে লাগল বাজারে।[৭] তখন থেকে নীলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ ও ইংরাজ ব্যবসায়ীরা।

নীল ব্যবসায়ের নতুন আন্তর্জাতিক প্রকৃতির কারণে প্রাচীন আঞ্চলিক ব্যবসা ভেঙ্গে পড়ল এবং বিপর্যয় নেমে এল আঞ্চলিক ব্যবসায়ের উপর। এ জন্যে কম মুশকিলে পড়েনি ইউরোপ। ইউরোপে তখন ব্যবহার হত ওয়াড গাছ থেকে উৎপন্ন ইন্ডিগো। বিভিন্ন উপনিবেশ থেকে আমদানী করা গ্রীষ্মমন্ডলীয় দেশের নীল ছিল ইউরোপীয় নীলের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। ইউরোপের ওয়াড রক্ষার জন্য ব্যবসায়ী মহল এক শতাব্দী জুড়ে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের সরকারের কাছে তদবির করে যাতে ইন্ডিগো নীল আমদানী বন্ধ করা যায়। তারা এ জন্যে ইন্ডিগো ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন থেকে শুরু করে নানা রকমভাবে শাস্তিদানের পন্থা গ্রহণের জন্য ওকালতি করে। এমনকি যারা ইন্ডিগো বেশি ব্যবহার করে, সেই ফরাসী রঞ্জকদের মৃত্যু দন্ডাদেশ দেওয়ার সুপারিশ করে। আমদানী করা নীলের বিরুদ্ধে শুরু হয় এক নোংরা আন্দোলন। ওরা বলত, এ হচ্ছে শয়তানের রং, বিষাক্ত প্রাণনাশকারী ও ক্ষয়কারক এক জিনিস, ক্ষতিকর।[৮] ইন্ডিগো নীলের বিরুদ্ধে এমন তুমুল আন্দোলন সত্ত্বেও এবং

এর বিরুদ্ধে শুল্ক আরোপের দাবী সত্ত্বেও ওয়াড-নীল ইন্ডিগো-নীলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে যায়।

এভাবে গ্রীষ্মমন্ডলীর দেশ থেকে আনা নীল ইউরোপের বাজারে পরিণত হল এক লোভনীয় পণ্য দ্রব্যে। ইউরোপীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো শেষে নীলের উৎপাদন তাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে চাইল। নতুন নতুন এলাকা যতই ঔপনিবেশিকদের হাতে পড়তে থাকল তারা চাইল নীল উৎপাদনকারী এলাকা যেন তাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। উপরন্ত্র, নতুন উপনিবেশে তারা নীল উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে লাগল। ইউরোপের সম্প্রসারিত বাজারে তারা যে শুধু নীল বাজারজাত করতে থাকল তাই নয় তারা নিজেদের উপনিবেশের নীল অত্যন্ত লাভজনকভাবে ইউরোপের অন্য দেশেও রফতানি করত। বিশ্ব-পুঁজিবাদের নতুন বাজারে ইন্ডিগো-নীল পরিণত হল এক তুমুল প্রতিযোগিতামূলক পণ্যে।

এশিয়ার নীলের উপর ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নিয়ন্ত্রণ ছিল পর্তুগালের। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল স্পেন। পর্তুগালের ব্যবসা স্পেন দখল করার চেষ্টা করত। মধ্য আমেরিকায় তাদের দখল করা নতুন উপনিবেশে তারা প্রবর্তন করল এশিয়া থেকে নীল গাছের। এভাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে মধ্য আমেরিকা ছেয়ে গেল শত শত বাণিজ্যিক নীল ক্ষেতে। বিশেষভাবে এল সালভেদর ও গুয়াতেমালায় নীলচাষ করা হত ব্যাপকভাবে, কেননা দেশ দু'টিতে খনিজ সম্পদ বিশেষ ছিল না বললেই চলে। নীল হল এসব দেশের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির ভিত্তি। মধ্য আমেরিকায় নীল চাষের স্বর্ণযুগ হল সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী। এখান থেকে বিপুল পরিমাণ নীল রফতানী করা হত স্পেনে (আবার সেখান থেকে অতিরিক্ত শুল্ক আদায় করে বৃটেন ও নেদারল্যাণ্ডে), পেরুতে ও মেক্সিকোয়। উনবিংশ শতাব্দীতে হাওয়া বইতে থাকে উল্টো দিকে। কেননা ওই সব দেশগুলো নীল আমদানীর উপর এত বেশি শুল্ক বসাতে থাকে যে, রফতানিতে নেমে আসে বিপর্যয়।[৯]

নীলের বিশ্ব-বাজারের বৈশিষ্ট্য ছিল আন্তঃ রাজ্য প্রতিযোগিতা। ক্যারিবীয় ও উত্তর আমেরিকার উপনিবেশে নীলচাষের ক্ষেত্রে ফরাসী ও বৃটিশরা ছিল অত্যন্ত সফল। জাভাতে ওলন্দাজদের অবস্থাও তাই।[১০] ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বিশ্বের অনেকখানে রফতানী-মানের উৎকৃষ্ট নীল উৎপাদিত হত। যেমন ঃ ফিলিপাইন, জাভা, ভারত, মরিশাস, মিসর, সেনেগাল, ভেনজুয়েলা, ব্রাজিল, গুয়াতেমালা, হাইতি ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা। বিশ্বে নীলের বাজার ক্রমেই অবিচ্ছিন্ন হতে লাগল এবং এই সংহত বাজারের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী রাজ্যগুলো তুমুল প্রতিযোগিতায় মেতে উঠল। এভাবে নীল হয়ে উঠল এক গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব পণ্য। আর, ইন্ডিগোর নীলচে রাজ্যগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ল এক অখন্ড জালে।

ইউরোপীয় বাজারে এমনিতেই শিল্প বিপ্লবের ফলে নীলের বিক্রী বেড়ে গিয়েছিল। ফরাসী বিপ্লবের পরে তা বেড়ে গেল অনেক। ফরাসী বিপ্লবের পরিণতি হিসাবে বিভিন্ন সেনাবাহিনীর মধ্যে যে যুদ্ধগুলো হচ্ছিল সে সব সেনা দলের ইউনিফর্ম ছিল নীল আর, তখনকার ফ্রান্সের ফ্যাশন ছিল নীল পোষাক।[১১]

ফরাসী বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে নীল রং-এর পোষাকের প্রচলন ছিল কম। তাই, বাংলার নীলচাষীদের ভাগ্য নির্ভর করত গুয়াতেমালায় সময় মত বৃষ্টি হয়েছে কিনা তার উপর অথবা মিসরে নীলক্ষেতে পঙ্গপালের আক্রমণের উপর। ইউরোপের ফটকাবাজারি ব্যবসায়ীদের খেয়ালখুশীর উপর নির্ভর করত বাংলার নীলচাষীদের দিনকাল। প্যারিসে ফ্যাশন ডিজাইনাররা নীল কতটা পছন্দ করছে, ঝড়ে আটলান্টিক সাগরে জাহাজডুবি হয়েছে কিনা এবং সেই ঝড়ে হাইতি থেকে আনা নীলের শুকনো দলা গলে গেছে কিনা তার উপর নির্ভর করছে বাংলার হত দরিদ্র নীলচাষীর কপাল।

নীল উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন বিরাট এক সফল বাণিজ্য হিসাবে অনবদ্য, সেইসঙ্গে মানবিক বিপর্যয় হিসাবেও প্রচন্ড। ইন্ডিগো রং উৎপাদন একটি শ্রমঘন উৎপাদন প্রক্রিয়া। নীলের আন্তর্জাতিক বাজারে চরম প্রতিযোগিতার অর্থই হল, নীল উৎপাদনে শ্রমিকের মজুরি যে যত কম দিতে পারবে সে লাভ করবে তত বেশি। নীল ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক অস্তিত্ব ও স্বার্থের জন্য যতটা সম্ভব সস্তা শ্রমের সন্ধান করত। এই কারণে নাম মাত্র দামে শ্রম কেনার জন্য শ্রমিকদের উপর নির্যাতন চালানো হত অমানুষিক। জুলুম করা হত ক্রীতদাসের মত। তাই বিশ্ব জুড়ে নীল ব্যবসার নীতি হল— যত পার শোষণ কর শ্রমিককে।

"এক চতুর্মুখী বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল এশীয় নীল রং-এ রঞ্জিত বস্ত্র নিয়ে। প্রথমে এই রঙিন কাপড় রফতানী করা হত ইউরোপে। তারপর ইউরোপ থেকে আবার এগুলো রফতানী করা হত পশ্চিম আফ্রিকায়। বিনিময় বাণিজ্যে ক্রীতদাস কিনতে হলে এশীয় নীল রং-এর কাপড়ের গুরুত্ব সমধিক। ওয়েষ্ট ইন্ডিজে কিংবা আমেরিকায় ইউরোপীয় নীলের খামারে যারা কাজ করত তাদের অধিকাংশই পশ্চিম আফ্রিকা থেকে আনা ক্রীতদাস। আবার আটলান্টিক পারি দিয়ে বিকিকিনির শেষ প্রান্ত ইউরোপে চালান করে বিক্রি করা হত এই ইন্ডিগো। ইউরোপীয়দের ইন্ডিগো নীলের ক্ষুধা মেটাতে নীল উৎপাদনে নিয়োজিত স্থানীয় কৃষক ও ক্রীতদাসদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের জীবনপাত করতে হত। এইসব কারণে ইন্ডিগো, নীলের ইতিহাস মানুষকে শোষণ করার বিষাদময় নীলাভ ইতিহাস।"[১২]

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নীলের বিশ্ব ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে এবার বঙ্গদেশের পালা। আবার সেই পুরানো কাহিনী, একদিকে অভূতপূর্ব বাণিজ্যিক সাফল্য অন্যদিকে করুণ মানবিক বিপর্যয়। নীলের বিশ্ব বাণিজ্যের পটভূমিকায় বাংলাদেশে নীলচাষের করুণ পরিণতি অনুধাবনের চেষ্টা করতে হবে। পরবর্তী দুইটি পরিচ্ছেদে

প্রথমতঃ আমরা বিবেচনা করব নীলের বিশ্ব বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আর দ্বিতীয়তঃ যে বাংলাদেশ নীলচাষের সঙ্গে আদৌ জড়িত ছিল না সে কি কি কারণে নীলচাষের এক উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হল, আর হঠাৎ কি করে বিশ্বের প্রধানতম নীল ব্যবসার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

জানিম্যান
বুকস

৩

নীলের বাণিজ্যে আধিপত্য ঃ স্পেন, ফ্রান্স ও বৃটেন

বিশ্ব বাণিজ্যের পণ্য দ্রব্য রূপে নীলের ইতিহাস এখনও অলিখিত।[১৩] সেকালে বিশ্বব্যাপী নীলের বাণিজ্যের সামগ্রিক অবয়ব কেমন ছিল তা নির্ণয় করা দুরূহ। প্রাচীনকাল থেকেই ভারত রফতানীকারী দেশ, তার রফতানী বিশেষভাবে ছিল ইউরোপে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইউরোপের প্রধান সরবরাহকারী ছিল ভারত। গ্রীষ্মপ্রধান আমেরিকায় ওপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হলে এই দীর্ঘ প্রতিষ্ঠিত সম্পর্কের কথা ধীরে ধীরে উন্মোচিত হতে থাকে। উত্তর ভারতের নীল ব্যবসা (প্রধানতঃ গুজরাট, সিন্ধু ও আগ্রা) যে ইউরোপে তার বাজার হারাতে থাকে তার আংশিক কারণ হল ভারতে উৎপন্ন নীলের সুনাম নষ্ট হয়ে যায়।[১৪] ইউরোপ প্রধানতঃ তার সম্প্রসারিত বস্ত্রশিল্পের জন্য ১৬৫০ খ্রীঃ থেকে ১৭৮০ অবধি তাদের বিরাট নীলের চালান আনতে শুরু করে আমেরিকা থেকে। আমেরিকান অঞ্চলের মধ্যে এ ব্যাপারে আগ্রহী ছিল হাইতি (তখন পরিচিত ছিল সেন্ট ডোমিনিক হিসাবে)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আমেরিকা ইউরোপে ১০ লাখ কেজি নীল রফতানি করেছিল। সাউথ ক্যারোলিনা ও গুয়াতেমালা রফতানি করেছিল এর অর্দ্ধেক পরিমাণ। এ ছাড়াও রফতানি করেছিল ভেনজুয়েলা ও ব্রাজিল আর জ্যামেইকার মত ছোটো রফতানিকারীরা।[১৫]

১৮০০ শতাব্দীর দিকে নীলের বিশ্ববাজারে একাধিক্রমে তিনটি বড় বড় ঝাপটা লাগে। এর ফলে ইউরোপে নীলের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণকারী তিনটি বড় বড় শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। মধ্য আমেরিকার নীলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় স্পেন। ক্যারেবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ থেকে আনা নীলের উপর অধিপত্য হারায় ফ্রান্স। তেমনি আবার উত্তর আমেরিকা থেকে আনা নীলের উপর নিয়ন্ত্রণ হারায় বৃটেন। এই সব উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে নীলের বাণিজ্যে প্রভাবশালী শক্তি হিসাবে অভ্যুদয় ঘটে বৃটেনের। বাণিজ্যিকভাবে নীল উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন একটি অঞ্চল—বঙ্গদেশের আবির্ভাবের ফলে বৃটেন অকস্মাৎ নীল উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে পরিগণিত হয়।